বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বর্ষ-০৯ সংখ্যা-০৩
জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতবিনিময় সভা এবং বিএফআরআই পরিদর্শন

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) মিলনায়তনে U.S. Forest Service International Programs এর Exchange Program এর আওতায় College of Life Science and Agriculture (COLSA), University of New Hampshire, USA এর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিএফআরআই এর বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার এবং রিসার্চ অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) ড. মো. মাহবুবুর রহমান। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ড. মো. জগলুল হোসেন, উপপ্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এবং Dr. Anthony Swick Davis, Dean, College of Life Science and Agriculture, University of New Hampshire, USA. এ সময়ে বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

এর পরে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত ৩৭ প্রজাতির বাঁশের সংগ্রহশালা ব্যাম্বুসেটাম, টিস্যুকালচার ল্যাবে বাঁশ ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম, প্রোপাগেশন ইউনিট, সঠিক প্রজাতির কাঠ শনাক্তকরণ বিষয়ক গবেষণা ল্যাব জাইলেরিয়াম, সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম ও ল্যাব এবং সিলভিকালচার নার্সারি পরিদর্শন করেন।

বিলুপ্তির পথে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষ: বৈলাম

বৈলাম Dipterocarpaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Anisoptera scaphula* (Roxb.) Pierre এবং এর ইংরেজি নাম Mascal wood tree. এ উদ্ভিদ প্রজাতিটি বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। IUCN এর Redlist এ বিশ্বব্যাপী তথা বাংলাদেশে বৈলাম একটি মহাবিপদাপন্ন (Critically Endangered) প্রজাতির গাছ। ২০১২ সালের প্রণীত বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনে বৈলাম গাছ রক্ষিত উদ্ভিদ (Protected Plant) হিসেবে অভিহিত। এই বৈলাম গাছ পরিণত হলে ২৪০ ফুটের বেশি উঁচু হয় যা প্রায় একটি ৩৫ তলা ভবনের সমান। বৈলাম কাঠ লম্বা এবং একই সাথে হালকা হওয়ার কারণে এর অনেক চাহিদা ছিল। এক সময় কক্সবাজার এলাকার মানুষ নৌকা তৈরির জন্য এই গাছ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতো। মানুষজন কাঠের জন্য নির্বিচারে বৈলাম গাছ কাটার কারণে, বন উজাড়, মাতৃবৃক্ষের অপ্রতুলতা ও অতিরিক্তভাবে কাঠ আহরণের ফলে বর্তমানে বৈলাম গাছ দুষ্প্রাপ্য এবং বিপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে বর্তমানে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার এলাকায় এখন কেবল মাত্র ৪০-৪৫টি পরিণত বৈলাম গাছ অবশিষ্ট আছে। ৩০-৪০ বছর আগেও এসব অঞ্চলে বৈলাম গাছ ছিল একটি পরিচিত দৃশ্য। তবে মানুষের বসবাসের জন্য বিপুল পরিমাণ গাছ কাটা হয়েছে। মায়ানমার থেকে লাখ লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজারে প্রবেশের পরও ব্যাপকহারে বৈলাম গাছ নিধন করা হয়েছে।

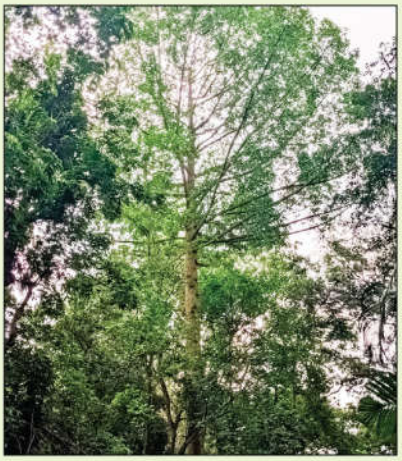

বিএফআরআই ক্যাম্পাসে সংরক্ষিত বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ বৈলাম

বৈলাম বড় আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় প্রায় ৬০-৭০ মিটার এবং বুক সমান উচ্চতায় গাছের বেড় ১৪০-১৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এ গাছের বৃদ্ধি ধীর গতিসম্পন্ন। গাছের গোড়াতে ঠেসমূল (Buttress) রয়েছে। গুড়ি বা প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, নলাকার এবং প্রায় ২০ মিটার পর্যন্ত গুঁড়িকাণ্ড ডালপালা বিহীন। গাছের মাথায় ডালপালা বিস্তৃতি ছাতার মতো মুকুট (crown) আকৃতির। বাকল অমসৃণ ও হালকা ধূসর বর্ণের। পাতা সরল, দীর্ঘায়িত,আয়তাকার, লম্বায় ৮-১৬ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় ৪-৮ সেন্টিমিটার, কিনারা সমৃণ এবং আগা সূচালো। পুষ্পমঞ্জরি রেসিম। বৃতি পেয়ালাকার, ধূসর ও রোমশ। পাপড়ি প্রশস্ত, ডিম্বাকার ও দীর্ঘায়িত, ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে হলুদাভ সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফুলের পুংকেশর ১৫-২০টি। ফল নাট জাতীয়, পাখনাসহ লম্বায় ১৪-১৫ সেন্টিমিটার ও ব্যাস ১.৩-২.৫ সেন্টিমিটার এবং পৃষ্ঠভাগ মসৃণ। ফলের শীর্ষভাগে ১৩.৩-১৩.৮ সেন্টিমিটার লম্বাটে দুটি পাতলা পাখনা (রিহম) এবং ৩টি ছোট আকারের পাখনা সংযুক্ত। মে-জুন মাসে পরিপক্ক ফল গাঢ় বাদামি বর্ণের হয়। সাধারণত বনাঞ্চলে বৈলামের বীজ থেকে চারা জন্মায় ও বংশবিস্তার হয়। বীজের আয়ুষ্কাল খুবই কম বিধায় নার্সারিতে পলিব্যাগে ২-৩ দিনের মধ্যে সংগৃহীত বীজ বপন করতে হয়। বীজ গজানো বা অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং ৫-৭ দিনের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হয়। এটি মূলত অতিরিক্তি আর্দ্র ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, এমন উষ্ণমণ্ডলীয় চিরহরিৎ অরণ্যে জন্মে। বৈলাম কাঠ হালকা হলুদাভ থেকে হালকা বাদামি বর্ণের, শক্ত, মজবুত এবং টেকসই। হালকা নির্মাণ কাজসহ গৃহ নির্মাণে, ফ্লোরিং ঘরের সিলিং ও প্যানেলিং ভিনিয়ার আসবাবপত্র, নৌযান ও যানবাহনের বডি নির্মাণে কাঠ ব্যবহৃত হয়।

বৈলাম গাছে ফুল আসতে ৩০ বছর লাগে এবং কাঠ সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত হতে প্রায় ৫০ বছর সময় লাগে। সেই জন্য স্থানীয়রা এটি সংরক্ষণে উদাসীন। বৈলাম গাছের প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম খুবই দুর্বল। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রজনন সীমাবদ্ধ। গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় বাংলাদেশ এটি বিপন্ন হওয়ার পথে। বৈলাম গাছ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এবং বাৎসরিক গড়ে ২,০০০-৩,০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত গাছটির জন্য উপকারী। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রাপ্ত তথ্য মতে গাছের প্রাথমিক আবাসস্থল কক্সবাজার অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত গত তিন দশকে প্রায় ২৩৪ মিলিমিটার কমেছে। একইভাবে গত ৪০ বছরে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। পরিবেশগত পরিবর্তনগুলো নির্দেশ করে যে, গত ৪০ বছরে জলবায়ু ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যা বৈলামের সংখ্যা কমাতে প্রভাব ফেলেছে। বৈলাম গাছে ফুল ফোটার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় মার্চ-এপ্রিল। আর বীজ সংগ্রহের সময় এপ্রিল থেকে মে। তাবে গাছ রোপণের জন্য উপযুক্ত এপ্রিল ও মে মাসে বাংলাদেশে এখন তাপপ্রবাহ দেখা যায় এবং বৃষ্টিপাতও কম হয়। বৈলামের আবাসস্থল একটি মাইক্রো-ক্লাইমেট চেঞ্জ এর সম্মুখীণ হচ্ছে। যার ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ব্যাহত হচ্ছে এবং এর চারা টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। বৈলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কৃত্রিমভাবে চারা তৈরি ও পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বৈলাম বৃক্ষ সংরক্ষণ করা না গেলে বৃক্ষটি এক দিন আমাদের দেশ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

যথাযোগ্য মর্যদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

শহিদবেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএফআরআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. এর প্রথম প্রহরে ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলার জন্য যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন সেই সকল ভাষা শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউ চট্টগ্রাম এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর পরে বিএফআরআই এর ক্যাম্পাস এলাকায় অবস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ সিপাহি মফিজুল ইসলাম এর সমাধিতে ইনস্টিটিউট এর পক্ষ থেকে এবং অফিসার্স ক্লাব বনানী সংঘ ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এ সময়ে সকল শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এর পরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত রাখা হয়।

বৌদ্ধ বিহার (কিয়াং): জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি সম্ভবনাময় মডেল

বৌদ্ধবিহারে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিএফআরআই এর পক্ষ থেকে দেশীয় প্রজাতির চারা বিতরণ

পার্বত্য জেলাগুলোর মধ্যে রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। লেক, সবুজ বন,বনানী ও ছোট বড় পাহাড়ে ঘেরা রাঙ্গামাটি জেলা কিন্তু ইদানীং রাঙ্গামাটির এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হারিয়ে যেতে বসেছে। কারণ জনসংখ্যার চাপ, কৃষি জমি সম্প্রসারণ,

অর্থনৈতিক চাহিদা বৃদ্ধি, গাছপালা কেটে জুম চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা, দেশীয় গাছপালা কেটে সেগুন বাগান তৈরি করা ইত্যাদি নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর ফলে পাহাড় হতে মাটি ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেখা দিচ্ছে পাহাড় ধসের মতো ঘটনা। ফলে জীববৈচিত্র্য হয়ে পড়ছে বিপন্ন কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো একটা দেশের আয়তনের শতকরা ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন কিন্তু আমাদের দেশে আছে এর সামান্য পরিমাণ। মানুষ তার বিভিন্ন প্রয়োজনে গাছপালা কাটছে কিন্তু সে পরিমাণ গাছ রোপণ করছে না। ফলে পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। এখন বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব তার প্রধান কারণ হলো নির্বিচারে গাছপালা কর্তন করা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেখা দিচ্ছে ঝড়, জ্বলোচ্ছাস, খরা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, সুনামি ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা পেতে হলে আমাদের অবশ্যই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং দেশীয় প্রজাতির প্রচুর গাছপালা রোপণ করতে হবে।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা পেতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কাজ করে চলেছে। এরই আলোকে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ হতে একটি স্টাডি হাতে নেওয়া হয়। আমরা বিভিন্ন বই ও প্রকাশনা থেকে জানতে পারি, এশিয়ার যে সব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ আছে যেমন: থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশগুলোতে বৌদ্ধ বিহারের ধর্মীয় গুরু ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রেখে চলেছে।

আমাদের দেশে রাঙ্গামাটি জেলার বৌদ্ধ বিহারগুলোর অধিকাংশই পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং এর চারপাশে বৌদ্ধ বিহারের অধীনে রয়েছে অনেক জায়গা। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা রাঙ্গামাটি জেলার মহালছড়ি উপজেলার বোধিপুর বন বিহার, কুতুকছড়ি বন বিহার, নির্বানপুর বন বিহার, খামার পাড়া বন বিহার ও রাজবন বন ভাবনা কেন্দ্র বন বিহার এই পাঁচটি বৌদ্ধ বিহারকে চিহ্নিত করি। রাঙ্গামাটি জেলায় বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস। এদের মধ্যে চাকমা জনগোষ্ঠীর বসবাস সবচেয়ে বেশি। এদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চাকমা ভাষায় তাদের প্রার্থনার স্থান বৌদ্ধ বিহারগুলোকে বলা হয় কিয়াং। এই বৌদ্ধ বিহারগুলোর প্রধান ধর্মীয় গুরুকে চাকমা ভাষায় বলা হয় ভান্তে এবং এখানে অনেক ধর্ম শিক্ষা গ্রহণকারী থাকে তাদের বলা হয় শ্রমন। এই বৌদ্ধ বিহারগুলোর প্রধান ধর্মীয় গুরুদের সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি। বিভিন্ন সময়ে আমরা স্থানীয় লোকজন ও ভান্তেদের সাথে আলোচনা সভা ও গ্রুপ মিটিং করি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গাছ লাগানোর গুরুত্ব তাদের সামনে তুলে ধরি। কেন আমরা গাছ সংরক্ষণ করব? গাছ সংরক্ষণ করলে আমাদের কি উপকার হবে? ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা তাদের কাছে তুলে ধরি।

আমরা তাদের বলি মহামতি গৌতম বুদ্ধের অমর বাণী "জীবে দয়া করা" এই জীবের প্রতি দয়া করতে হলে অব্যশই গাছ লাগাতে হবে এবং গাছ লাগালে এখানে প্রচুর পশুপাখি ও বানরসহ নানা ধরনের প্রাণী বসবাস করবে এবং তারা গাছের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করবে। ফলে মহামতি বুদ্ধের বাণী জীবের প্রতি দয়া করা হবে। এই বৌদ্ধ বিহার গুলোর আশেপাশে যে সব গাছপালা জন্মায় তাকে তারা পবিত্র বলে মনে করে, ফলে কেউ এখান থেকে গাছ পালা কাটে না। তাই বিহারগুলো গাছ সংরক্ষণের একটি উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সেই মোতাবেক বিহারগুলোকে গাছ সংরক্ষণের মডেল হিসেবে উপস্থাপনের

কুতুকছড়ি, রাঙ্গামাটি বৌদ্ধবিহার এলাকায় দেশীয় প্রজাতির চারারোপণ

জন্য উক্ত গবেষণা স্টাডি পরিচালনা করা হয়। আমরা তাদের গাছ সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হই এবং বৌদ্ধ বিহারগুলোকে গাছ সংরক্ষণের মডেল হিসেবে উপস্থাপনের ব্যাপারে তাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাছ লাগানো ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সাধারণ লোকদের সামনে তুলে ধরার জন্য ভান্তেদের অনুরোধ করি। নিম গাছ ও বট গাছকে তারা পবিত্র বৃক্ষ বলে মনে করে। নিম গাছ বিহারের পরিবেশ নির্মল, সুন্দর ও রোগমুক্ত রাখে। তা ছাড়া সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বিহারের চারপাশে তারা প্রচুর চম্পাফুল, গর্জন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, উরিআম, কদম, কাঠবাদাম, কন্যারী, নাগলিঙ্গম, বকুল, বান্দরহোলা, পীতরাজ, অর্জুন, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি গাছগুলো প্রচুর পরিমাণে লাগিয়েছে এবং তা সংরক্ষণ করছে।

বৌদ্ধ বিহারের আশেপাশে তারা কোনো ফলমূলের গাছ লাগায় না কারণ যে সব ভক্ত বিহার দর্শন ও প্রার্থনার জন্য আসবে এবং যে সকল ধর্ম শিক্ষাগ্রহণকারী (শ্রমন) থাকবে তাদের ফলের প্রতি লোভ হবে এবং প্রার্থনায় পূর্ণভাবে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই তারা শুধু দেশীয় প্রজাতির বনজ গাছপালা রোপণ করে থাকে। বৌদ্ধ বিহারের ধর্মীয় গুরুরা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় লোকজনদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও গাছপালা লাগানোর ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এর ফলে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে গাছপালা লাগানোর ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এই বিহারগুলো জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটা মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সারা দেশে যেখানে গাছ কাটার মহোৎসব চলছে, সেখানে এই বৌদ্ধ বিহারগুলো গাছ সংরক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এভাবে আমাদের দেশে যে সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলো আছে তাদের ফাঁকা জায়গাগুলোতে গাছ লাগিয়ে তা সংরক্ষণ করতে পারলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে কিছুটা হলেও আমাদের দেশকে রক্ষা করা সম্ভব। পরিশেষে এই বৌদ্ধ বিহারগুলোর ধর্মীয় গুরুদের অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই যে তারা গাছ রোপণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে বলে। এইভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যদি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এগিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই আমাদের দেশটা একদিন সবুজে সবুজে ভরে যাবে।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

রক্তচন্দনের সাতসতের

রক্তচন্দন বা লালচন্দন Fabaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Pterocarpus santalinus* L.f. এবং ইংরেজি নাম রেড স্যান্ডর্স। আসলে রক্তচন্দন বা লাল চন্দনের বাংলা নাম রঞ্জনা। চন্দন ভারতীয় একটি গাছ বলে ধারণা করা হয়। রামায়ণ, মহাভারত এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও উল্লেখ পাওয়া যায় লাল চন্দনের। তবে কেউ কেউ মনে করেন চন্দনের আদি নিবাস ইন্দোনেশিয়ার তিমুর দ্বীপে। তবে রক্ত চন্দন সবচেয়ে বেশি জন্মে দক্ষিণ ভারতে। পৃথিবীর অন্য কোথাও রক্তচন্দন গাছ না হওয়ার মূল কারণ আবহাওয়া এবং মাটির গুণাগুণের তারতম্য। মাত্র ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তারতম্যের কারণেই মারা যেতে পারে লাল চন্দন। বিরল এই গাছটি কেবল ভারতের এই অঞ্চলে জন্মানোর মূল কারণ এটিই। যদিও দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশে অল্প পরিমাণ রক্ত চন্দন দেখা যায়।

মধুপুর জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষিত রক্তচন্দন গাছ

একেকটি রক্তচন্দন গাছের উচ্চতা হয় ৮-১২ মিটার। এদের পাতা ৩-৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা এবং ফুল হলুদ। সাদা চন্দনে সুঘ্রাণ থাকলেও রক্তচন্দনো কোনো গন্ধ নেই। কিন্তু এর কাঠের বিশেষ গুণের জন্য বিশ্বজুড়ে এটির বিপুল চাহিদা। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) ২০১৮ সালে এই গাছকে 'বিলুপ্তপ্রায়' প্রজাতির তালিকাভুক্ত করেছে। বিরল প্রজাতির এই উদ্ভিদ স্বর্ণের মতোই মূল্যবান। বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান কাঠের একটি লাল চন্দন। প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বজুড়ে রূপচর্চার অন্যতম উপাদান চন্দন। পরিপক্ব রক্তচন্দন খুবই দুষ্প্রাপ্য কারণ কয়েকশ বছর লাগে এদের পরিপক্ব হতে। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ হওয়ায় এই কাঠের ঘনত্ব খুব বেশি। রক্তচন্দন এক ধরনের রঞ্জক উৎপাদন করে যা খাদ্যে এবং ওষুধে ব্যবহারযোগ্য। এই গাছের বাকল এবং কাঠের নির্যাসেরও বেশ কিছু ঔষধি গুণ রয়েছে। জাহাজ নির্মাণ এবং নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের বিকিরণ কমাতে রক্তচন্দন কাঠ ব্যবহার করা হয়। এর হাজার উপকারী দিক থাকলেও তার কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকা অসম্ভব নয়। রক্ত চন্দনেরও কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যাদের অ্যালর্জির সমস্যা রয়েছে রক্ত চন্দনের ব্যবহারে তাদের গায়ে র‍্যাশ উঠতে দেখা গেছে। চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং অস্ট্রেলিয়ায় রক্তচন্দন কাঠের বিপুল চাহিদা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি চাহিদা চীনে। বাংলাদেশে রক্তচন্দন গাছ জন্মে না তবে অতিসম্প্রতি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর জাতীয় উদ্যানে একটি রক্তচন্দন গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। গাছটি সংরক্ষণ এবং এর থেকে চারা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এর বীজের অঙ্কুরোদগম হার খুবই কম বিধায় টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে এর বংশবিস্তারের চেষ্টা করা উচিত।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

জীবন বাঁচাতে ও পরিবেশ সাজাতে

সৌন্দর্য বর্ধন, পরিবেশের সামগ্রিক শুদ্ধতা রক্ষায় গাছের ভূমিকা অনন্য। গাছের রয়েছে নানা ভেষজ গুণ। এমন একটি গাছ রয়েছে আমাদের দেশে, যা জীবন বাঁচাতে ও পরিবেশ সাজাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গাছটির নাম হচ্ছে জারুল। গাছটির ইংরেজি নাম Giant crape-myrtle এটি Lythraceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম *Lagerstroemia speciosa* (L.) Pers. উঁচু-নিচু সব ধরনের জমিতে জারুল গাছ জন্মে এবং বাড়েও অতিদ্রুত। জারুল একান্তই আমাদের দেশি গাছ। আদি নিবাস বাংলা-ভারত, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, চীন, মালয়। এর লালচে কাঠ দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী এবং বহু কাজের উপযুক্ত। আমাদের দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশে হাজার হাজার বছরে সে বেড়ে উঠেছে। পরিবেশের উপর তার কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া নেই ববং আছে ইতিবাচক প্রভাব। গাছটি অত্যন্ত জলসহিষ্ণু বলে পানির মধ্যে যেমন বেঁচে থাকে তেমনি কাঠ পানিতে মোটেও নষ্ট হয় না।

পত্রঝরা এই বৃক্ষটি শীতকালে পত্রশূন্য থাকে। বসন্তে নতুন গাঢ় সবুজ পাতা গজায়। গাছ সাধারণত ১০-২৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। গাছের পাতা সবুজ এবং পুরু ও বেশ প্রশস্থ ধরনের। গাছের শাখা-প্রশাখা ও কাণ্ড শক্ত। শাখা প্রশাখার অগ্রভাগের দণ্ডের বোঁটায় অসংখ্য ফুল ফোটে। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত ফুল আসে। ফুল ঝরে পরার পর ফল পরিপক্ব হতে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সময় লাগে। গাছ ফুলে ছেঁয়ে গেলেও চারপাশে তেমন সুগন্ধি ছড়ায় না তবে এর দৃষ্টিনন্দন রং ও রূপের শোভায় সবারই চোখ আটকে যায়। ফুল ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার চওড়া হয় এবং হালকা সোনালি পুংকেশর থাকে। ফল ডিম্বাকার, শক্ত ও বিদারি। বীজ ১ সেন্টিমিটার চওড়া,

ফুল শোভিত জারুল গাছ

পাতলা বাদামি রঙের। বীজ থেকেই এর বংশবৃদ্ধি হয়। কাঠের রং লালচে ধরনের। কাঠগুলো বেশ শক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী। জমি চাষের লাঙল, ঘর নির্মাণ, নৌকা, পুল, ট্রাক, বাসের বডি ও আসবাবপত্র তৈরিতে জারুল কাঠ ব্যবহার করা হয়। জারুল গাছের বিভিন্ন অংশের রয়েছে ভেষজ গুণ। যেমন: বাত, কাশি, অনিদ্রা, জ্বর, ডায়াবেটিস, অজীর্ণতাসহ বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে জারুল গাছের বিভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হয়। একদিকে জারুল গাছের ফুল পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে অন্য দিকে এর ঔষধি গুণ মানুষের জীবন রক্ষা করছে। বহুগুণে গুণান্বিত এবং পরিবেশের জন্য উপকারী গাছটি বিস্তার ও সংরক্ষণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন

গত ২১ মার্চ ২০২৪ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এবার আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য 'উদ্ভাবনায় বন, সম্ভাবনায় বন'। দিবসের শুরুতে বিএফআরআই এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয় এবং র‍্যালি শেষে বন দিবস স্মরণে বন ইনভেন্টরি ভবনের সামনে গুর্জা বাটনা বৃক্ষের একটি চারা রোপণ করা হয়। এর পরে জুম প্লাটফর্মে বিএফআরআই এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) ড. মো. মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন।

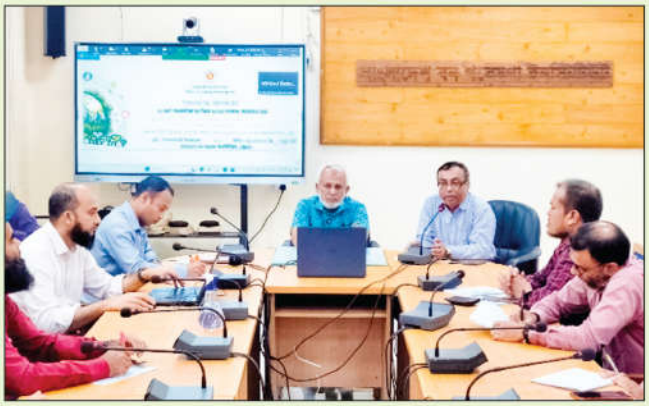

আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় অধ্যাপক ড. কামাল হোসাইন বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন শুধু আমাদের অক্সিজেনই সরবরাহ করে না, মানুষ, প্রাণী, পোকামাকড়, বন্য প্রাণীকে আশ্রয় দেয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে ও আর্দ্রতার ভারসাম্য রক্ষা করে। পৃথিবীতে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে, অক্সিজেন সরবরাহ করতে, পর্যটন শিল্পের বিকাশে ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে গাছপালা কিংবা বনভূমি।

গাছ যেমন করে একসঙ্গে আমাদেরকে তাদের অক্সিজেন দিয়ে, তাদের কাঠ দিয়ে, তাদের পাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তেমনিভাবে আমাদের একতাবদ্ধভাবে গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গাছ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য হার্ট স্বরূপ। গাছকে ভালোবাসা প্রকৃতিকে ভালোবাসা এবং প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গাছ আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করছে। আজকের এই আন্তর্জাতিক বন দিবস যেন আমাদের এই অঙ্গীকার হয় আমরা সবাই মিলে গাছকে রক্ষা করবো, গাছ রোপণ করবো এবং তার পরিচর্যা করবো। ১৯৯২ সালে 'রিও ঘোষণায়' বন সৃজন ও রক্ষার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পর ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় বন ও বনভূমির নিরাপত্তা রক্ষার্থে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। এর মধ্যে বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের ১০.৭৪%। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭% এ উন্নীত হয়েছে। যা ২০২৫ সালের মধ্যে ২৪% এর বেশি উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, শিল্পায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ ও নগরায়ণের ফলে বিশ্বব্যাপী বন ও বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বন অপরিহার্য। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে। এতে করে সমুদ্র উপকূলের নিচু এলাকা তলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। আমাদের দেশের নিচু এলাকাও সাগরের লোনা পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য সারা বিশ্বে বনভূমি বৃদ্ধি করা উচিত বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীতে প্রতিবছর উজাড় হচ্ছে বনভূমি।

বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) বলেন আমরা সবাই বুঝি বনের কি গুরুত্ব, গাছের কি গুরুত্ব। আমাদের জীবনে কাঠের বহুল ব্যবহার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন আমরা কাঠের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার করি। এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী তা ভাবার বিষয়। কাঠের গুরুত্ব কাঠই একমাত্র বহন করে। কাঠের কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর ১.৬ বিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বন সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ব্যাপারে আমাদের জনগণের মধ্যে সচেতনতা আনতে হবে। সবার মধ্যে সচেতনতা আসলে আমরা আশাকরি, আমাদের দেশ বন সংরক্ষণে এগিয়ে যাবে। বন সংরক্ষণে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো বনই সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। আমাদের মতো জনবহুল দেশে বন সংরক্ষণ একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। বন রক্ষার জন্য স্থানীয় জনগণের সহায়তার সাথে রাজনৈতিক সদিচ্ছারও প্রয়োজন আছে। সবার যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে বন সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালিতে বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য

জলবায়ু পরিবর্তনের অব্যাহত ধারাবাহিকতায় বিশ্বের পরিবেশ আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের সকল দেশকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় অঞ্চল সমৃদ্ধ দেশ এবং ছোট ছোট দ্বীপ দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হবে সবচেয়ে বেশি। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর মতে, বিগত আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ০.৬০ সেলসিয়াস। তাদের মতে, একুশ শতকের শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৪০ সেলসিয়াস থেকে ৫.৮০ সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি ২.৫০ সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় তাহলে বিশ্ব জনগোষ্ঠীর ২৫ কোটির অধিক জনগণ মারাত্মক ঘাতক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে পোহাতে হবে জীবন-জীবিকার নানান দুর্ভোগ। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায় যে, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বন্যা প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। মূলত এসবের অন্তরালে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। যা জীবন-জীবিকাসহ পরিবেশের উপর বহুমাত্রিক কুফলকে তুলে ধরেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের জীবন-জীবিকার প্রধান নিয়ামক জীববৈচিত্র্যের উপর যে মারাত্মক ধ্বংস নিয়ে আসছে, তা আমাদের প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে জানিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের প্রবালসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে প্রকৃতিতে অতিমাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন। মানব সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে বটে, তবে তার জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বর্তমানে যে হারে বন ধ্বংস হচ্ছে তাতে প্রায় ২০ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রকৃতিতে যোগ হচ্ছে। বনায়ন ও বন সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এই ২০ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কমানো সম্ভব। নোনা পানির বন বা প্যারাবন সংরক্ষণ করে উপকূলীয় অঞ্চলকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি থেকে বিশেষ করে ওই অঞ্চলের জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা যায়। তবে ইতোমধ্যে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। এ বিষয়ে যদি আমরা সচেতন না হই তবে আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে অনেক প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জীববৈচিত্র্য এমন এক সম্পদ, যা একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা আর কোনোভাবেই ফিরিয়ে আনা যায় না। সুতরাং আমাদের এই সম্পদ রক্ষায় সবাইকে সচেতন হতে হবে। জলবায়ু পবির্তনের ফলে যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে। ফলে উন্নত বিশ্ব থেকে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানোর আন্দোলনে বাংলাদেশকে যেমন শরিক হতে হবে, তেমনি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে হবে। যেসব প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা অধিকতর স্পর্শকাতর তাদের চিহ্নিত করে সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্যের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। সেই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার মতো কার্যক্রম গ্রহণ থেকে যতটুকু সম্ভব বিরত থাকা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে কীভাবে খাপ খাওয়ানো যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এসব উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা এবং তাদের অভিজ্ঞাতালব্ধ সুচিন্তিত মতামত জাতীয় নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবসম্মত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা গেলে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজেই সম্ভব হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ যে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার, বিজ্ঞানী, সুশীলসমাজ, এনজিও এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

খনা/কানাইডিঙ্গা বাংলাদেশের বিপন্ন বৃক্ষ

খনা/কানাইডিঙ্গা Bignoniaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Oroxylum indicum* (L.) Kurz. এবং ইংরেজি নাম Broken Bones Tree। চাকমারা বলেন, হনাগুলো (হনা), ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বলেন টকারুঙ, আর মারমারা ডাকেন ক্রংশ্যাসি নামে। এছাড়া গাছের অন্যান্য প্রচলিত নাম যেমন: কটম্ভর, প্রিয়জীব, দীর্ঘবৃন্তক, পীতপাদপ ইত্যাদি। কানাইডিঙ্গা গাছ উচ্চতায় ৮-১২ মিটার বা সর্বোচ্চ ২০ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। এদের কাণ্ড সরল সোজা নলাকার এবং বাকল পুরু নরমও ধূসর বাদামি বর্ণের। পাতা যৌগিক, বোঁটা লম্বাটে, পত্র ফলক লম্বায় ১২০-১৮০ সেন্টিমিটার, দ্বি বা ত্রি-শাখান্বিতভাবে এবং অসংখ্য পত্রকযুক্ত। পত্রকগুলো ডিম্বাকার, লম্বায় ৭-২০ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় ২-৭ সেন্টিমিটার, কিনারা ঢেউ খেলানো এবং আগা সূচালো। এর গুচ্ছবদ্ধ ফুল বেশ বড়, ঈষৎ হলুদ-বেগুনি রঙের। প্রস্ফুটিত ফুল অতি প্রত্যুষে দিনের আলো ফোটার আগে ঝরে পড়ে। ফলে পরাগায়ণের কাজটি রাতে বাদুরের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ফুলটি দেখতে সুন্দর হলেও সুগন্ধি নয় বরং দুর্গন্ধযুক্ত। প্রস্ফুটনকাল দীর্ঘ, বর্ষার শেষভাগ থেকে প্রায় হেমন্ত

খনা বা কানাইডিঙ্গা গাছসহ ফল

পর্যন্ত। লম্বাটে মঞ্জরিদণ্ডের আগায় আঙুলের ডগার মতো অসংখ্য ফুলের কলি ঝুলে থাকে। গুচ্ছবদ্ধ ফুল বেশ বড়, ঈষৎ হলুদ-বেগুনি রঙের, পাঁচটি পাপড়ি গভীরভাবে মোড়ানো।

ফল পড জাতীয়, তলোয়ারের মতো বাঁকা, লম্বায় ৪৫-৭৫ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় ৫-৮ সেন্টিমিটার, উভয় পার্শ্ব চ্যাপ্টা এবং দুই প্রান্ত ক্রমাগত

সরু। প্রতিটি ফলের ওজন ৭৭-১২৬ গ্রাম হয়ে থাকে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পাতাবিহীন ডালপালাতে লম্বাটে কাষ্ঠল ধরনের কালচে বর্ণের পরিপক্ব ফলগুলো ঝুলে থাকে। ফলগুলো ফেটে গিয়ে বীজ বের হয়। বীজগুলো লম্বায় ৫-৭ সেন্টিমিটার, চ্যাপ্টা ও সাদা বর্ণের এবং বীজের তিন পার্শ্ব কাগজের মতো পাতলা পাখনাযুক্ত। তরবারির মতো দেখতে দীর্ঘতম ফলের জন্যও এ গাছটি বিখ্যাত। কানাইডিঙ্গা ফুল ও ফল পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়িদের জনপ্রিয় সবজি। শুধু সবজি হিসেবেই নয়, কানাইডিঙ্গা ফল ঔষধি গুণে ভরপুর। কানাইডিঙ্গা গাছ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। এছাড়া ভূটান, ভারত, চীন, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইনসহ বেশ কিছু দেশে গাছটি পাওয়া যায়। কানাইডিঙ্গা গাছের মূল ও ছাল, ফল ও পাতা জন্ডিস, শরীরব্যাথার মতো সমস্যায় ওষুধ হিসেবে কাজে লাগে। জন্ডিস হলে ছাল বেটে গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে শরবত করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া অজীর্ণ, ডায়রিয়া, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, বতজ্বরসহ নানা রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কুকুরে কামড়ালে গাছের ছাল গোলমরিচসহ পিষে খেলে উপকার পাওয়া যায়। কাঠ হলুদাভ-বাদামি বর্ণের, ভারী ও মজবুত। বাকল ও ফল (পড) থেকে ট্যানিন ও রং পাওয়া যায়।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

গুণে ভরা মাকাল ফল

বাইরে সুন্দর, ভেতরে কিছুই নেই এই বিশেষ উপমার সংক্ষিপ্ত রূপ মাকাল ফল। বাংলা বাগধারায় মাকাল ফল একটি বিশেষ প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। মাকাল Cucurbitaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি লতানো উদ্ভিদ। মাকাল ফলের বৈজ্ঞানিক নাম *Trichosanthes tricuspidata* Lour. Fl. মাকাল ফল দেখতে গোলাকৃতির। কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ, কিছুদিন পর হলুদ এবং ফলটি পাকার পর লাল রং ধারণ করে। মাকাল ফল দেখতে আপেলে মতো। পূর্ণাঙ্গ মাকাল ফলের ওজন ৭৫-১০০ গ্রাম। পাকা মাকাল ফলের সৌন্দর্য যে কাউকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই ফলের ভেতরটা দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত। বারোমাসি এই ফল খাওয়ার অনুপযোগী। পৃথিবীতে এই পরিবারের ৪২টি প্রজাতি পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে ১২টি প্রজাতি। এ গাছের জন্মস্থান তুরস্ক। তুরস্ক থেকে এশিয়া মহাদেশ ও আফ্রিকা মহাদেশে গাছটি বিস্তার ঘটে। এটি একটি বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। মাকাল ফলের গাছ জঙ্গল বা বাড়ির বড় বড় গাছকে আঁকড়ে ধরে বেড়ে ওঠে। লম্বায় প্রায় ৩০-৪০ ফুট পর্যন্ত হয়। গাছের পাতা দেখতে হাতের তালুর মতো। প্রতিটি পাতায় ৩-৭টি করে খাঁজ থাকে। পাতাগুলো একান্তরভাবে সজ্জিত। পাতার কক্ষে ফুল ফোটে। ফুল ছোট সাদা রঙের এবং একলিঙ্গ। ফলে প্রচুর পরিমাণে বীজ থাকে। শাঁস ধূসর বর্ণের এবং স্বাদ খুব তিতা। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

মাকাল ফল ও গাছের রয়েছে ঔষধি গুণ। এটি একটি পরিবেশবান্ধব গাছ। মাকাল গাছের শিকড় কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। কফ ও শ্বাসকষ্ট নিরাময়ে, নাক ও কানের ক্ষত উপশমে মাকাল গাছ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জন্ডিস, দেহে পানি জমা, স্তনের প্রদাহ, প্রস্রাবের সমস্যা, বাত ব্যাথা, পেট ফোলা ও শিশুদের অ্যাজমা নিরাময়ে মাকালগাছের ফল, মূল, কাণ্ড বিশেষ ভূমিকা রাখে। মাকাল

মাকাল ফল

ফলের বীজের তেল সাপের কামড়, পেটের সমস্যা (আমাশয়, ডায়রিয়া), মৃগীরোগ ও সাবান উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। মাকাল ফলের বীচি ও আঁশ শুকিয়ে গুড়া করে পানিতে দ্রবীভূত করে ফসলে প্রয়োগ করা যায়। এই দ্রবণ ফসলের পোকামাকড়, ইঁদুর ও রোগ-বালাই দমনে বিষ হিসেবে কাজ করে। এর বিষ ফসলের জন্য মোটেও ক্ষতিকর নয়। এছাড়া মাকাল ফলের বীজের তেল চুলের বৃদ্ধি ও চুল কালো করতে কার্যকর। তাছাড়া পাখিদের অন্যতম প্রিয় খাবার মাকাল ফল। পাকা মাকাল ফলের সৌন্দর্য যে কাউকে বিমোহিত করবে। মাকাল গাছ বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। নানা কারণে প্রাকৃতিক বন উজাড় হওয়ায় এটি হারিয়ে যাচ্ছে। মাকাল ফলের গাছটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে হয়ত অচিরেই এটি আমাদের প্রকৃতি থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। এটি সংরক্ষণ আমাদের সবাইকে যত্নবান হওয়া উচিত।

উৎস: অসীম কুমার পাল, বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা : শামিমা বেগম	- পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	অসীম কুমার পাল	- আহ্বায়ক
ড. ওয়াহিদা পারভীন	- সদস্য সচিব	মো: এমদাদুল হক	- সদস্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

E-mail : editorbfrinewsletter@gmail.com, web : www.bfri.gov.bd

ফোন : +৮৮-০২৪১৩৮০৭১৫, +৮৮-০২৪১৩৮০৭০১